ইউনিট ২
বাংলা ভাষা

পাঠ ২.১ : বাংলা ভাষার পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা কীভাবে বিকাশ লাভ করল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষার পরিচয়

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাচ্য শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা হলো বাংলা। এই ভাষাবংশ খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইউরোপ, এশিয়ার ইরান ও ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে বিকাশ লাভ করে। এই ভাষাগোষ্ঠীর মূল আবাসভূমি ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্তী উত্তরে দানিয়ুব নদীর মুখ থেকে কাস্পিয়ান সাগরের অঞ্চলবর্তী ভূখণ্ডে। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মূল অঞ্চল থেকে ভাষাব্যবহারকারীরা ইউরোপের পশ্চিম অঞ্চলে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে একটি দল প্রথমে ইরানে প্রবেশের পর সেখান থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। তারা ভারতের উত্তরাঞ্চলে বসবাসের পর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন সময়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এরাই ভারতবর্ষে আর্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এদের ব্যবহৃত ভাষার প্রভাবেই নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত একটি ভাষারূপে খ্রিস্টীয় ৭ম থেকে ৯ম শতকে বাংলা উদ্ভূত ও বিকশিত হয়। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রভাব থাকলেও এর ব্যাকরণ এবং প্রয়োগবিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজস্ব পথ অনুসারী। আধুনিক কালের প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে, বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কারণে এবং এদের বানানরীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার নির্দেশনা বাংলা ভাষায় অনুসৃত হলেও বাংলা ভাষার উদ্ভবে সংস্কৃত ভাষার প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা যেমন নেই তেমনি সরাসরি কোনো প্রভাবও নেই। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষা যেমন হিন্দি, মারাঠি কিংবা গুজরাটি যে মাত্রায় সংস্কৃত ভাষার রূপরীতি মেনে চলে তার তুলনায় বাংলা ভাষা অনেক বেশি স্বাধীনতা নিয়েই তার আদি-মধ্য স্তর অতিক্রম করে আধুনিক স্তরে উপনীত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ ২.২ : বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপ ও রীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপের পার্থক্য লিখতে পারবেন।

বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপ ও রীতি

উদ্ভবের পর থেকে আধুনিক বাংলা ভাষায় সাধু, চলতি ও আঞ্চলিক – এই তিন রকম রীতি প্রচলিত। এই তিন রীতির মধ্যে পার্থক্য মূলত ক্রিয়া সর্বনাম এবং রূপমূল ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এদের মধ্যে আঞ্চলিক রীতি একান্তভাবেই অকৃত্রিম। অঞ্চল ভেদে সৃষ্টি হওয়া উপভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম ও রূপমূলের আশ্রয়ে এই রীতি বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে, চলতি তথা প্রমিতরীতিতে সাধুরীতির রূপমূল অপেক্ষাকৃত সংকুচিত (রৌদ্র>রোদ, মস্তক>মাথা, তাহার>তার) রূপে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ নদীয়ার কৃষ্ণনগর অঞ্চলের কথ্যরূপ অবলম্বনে গঠিত হলেও পরবর্তীকালে ঢাকা ও কলকাতার প্রমিতরূপের মধ্যে উচ্চারণভঙ্গির রূপমূলের ব্যবহারগত পার্থক্য লক্ষ করা যায় (ঢাকা 'যখন থেকে', কলকাতা 'যবে থেকে', ঢাকা 'তুই গিয়েছিলি', কলকাতা 'তুই গিয়েছিলিশ' প্রভৃতি)। প্রকাশের দিক থেকে বাংলা ভাষায় দুটি রূপ বা রীতি আছে কথ্য ও লেখ্য রীতি। লেখার ক্ষেত্রে আবার সাধু ও চলতি এরূপ দুই ভাগ রয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধুরীতি সংস্কৃত ভাষাঘনিষ্ঠ পণ্ডিত ও বোদ্ধা লেখকদের লেখার উপযোগী প্রায়-কৃত্রিম ভাষা। চলতি রীতিতে সাহিত্য সৃষ্টির সূচনার আগ পর্যন্ত এ রীতিতে সাহিত্য সৃষ্টি হতো। সাধু ভাষার রক্ষণশীল গণ্ডি ভেঙে সৃষ্টি হয় বাংলা ভাষার চলতি রীতি। স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন এবং প্রচলতি আদর্শ প্রমিত ভাষাকে চলতি ভাষা বলে। বর্তমানে সব ধরনের বই, পত্রিকা ইত্যাদি এই রীতি অনুসরণ করেই প্রকাশিত হচ্ছে।

সাধুরীতিতে তৎসম শব্দের প্রাধান্য বেশি; এটি কঠিন ও গম্ভীর স্বভাবের, আঞ্চলিক প্রভাবমুক্ত এবং এসব বানান নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনশীল। অপরদিকে, চলতি রীতিতে তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য বেশি; এটি সহজ ও সাবলীল স্বভাবের, লেখা ও বলা দুইয়ের উপযোগী, আঞ্চলিক প্রভাবযুক্ত, তুলনামূলকভাবে কম কৃত্রিম এবং অধিকতর পরিবর্তনশীল।

সাধু ও চলতি রীতির বাক্য রূপান্তরের নমুনা

সাধু : কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতি ভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে– এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন।

চলতি : কয়েক পা গিয়ে শকুন্তলার গতি থেমে গেল। শকুন্তলা, আমার আঁচল ধরে কে টানছে– এই বলে মুখ ফেরালেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপ ও রীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ২.৩ : সাধু ও চলতি ভাষারীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সাধু ও চলতি ভাষা কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- সাধু ও চলতি ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

পৃথিবীর সকল ভাষাতেই গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছে পদ্যের অনেক পরে; পদ্যেই রচিত হয়েছে প্রাচীনতম সাহিত্য। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আনুমানিক হিসাব করে বলা যায় যে, বাংলা কবিতার বয়স যদি হয় দেড় হাজার বছর তবে বাংলা গদ্যের বয়স মাত্র শ'দুয়েক বছর। সমগ্র মধ্যযুগের (১২০১-১৮০০ পর্যন্ত) বাংলা সাহিত্যে গদ্যের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা পরিমাণে খুবই সামান্য; তাও সীমাবদ্ধ ছিল দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র রচনার মধ্যে। সেদিক থেকে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূত্রপাত আধুনিক যুগে (১৮০১-বর্তমান কাল অবধি)। এদেশে ইংরেজদের আগমনের পর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১৮০০ সাল)-কে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্য চর্চা বেগবান হয়। উল্লেখিত হয়েছে যে, এর আগে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল স্বল্প এবং সীমিত পরিসরে। এ থেকে মনে করার কোনো কারণ নেই, প্রাচীন বা মধ্যযুগের লোকেরা কথাবার্তা বলত পদ্যে; ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে। আসলে কথাবার্তার ক্ষেত্রে কোনোদিনই কেউ কবিতা ব্যবহার করত না, বলত গদ্যেই, এখনও যেমন আমরা বলি। কিন্তু তারপরও সাহিত্য রচনার জন্য দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হয়েছে কবিতা বা কবিতার ভঙ্গি।

সাধারণ কথাবার্তা যখন মানুষেরা বলে তখন ভাষা ব্যাকরণের আঁটো-সাঁটো বন্ধনের অনেক বাইরে থাকে অর্থাৎ ব্যাকরণ তখন কড়াকড়িভাবে আরোপ করা হয় না, ভাষীরা আরোপ করেন না– ভাব প্রকাশ করাই সেখানে মুখ্য। কিন্তু লৈখিক রূপ বা লেখ্য রূপ অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট বা সুনিয়ন্ত্রিত। বাংলা ভাষার মৌখিক রূপের যেমন চলতি ও আঞ্চলিক এই দুই ভাগ রয়েছে তেমনি। লৈখিক রূপ বা লেখ্যরূপেরও আদর্শ চলতি রীতি (Standard Colloquial Style) এবং সাধুরীতি (Standard Written Form) দুটো ভাগ বিদ্যমান। বাংলা গদ্যের উল্লিখিত বৈচিত্র্য নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় :

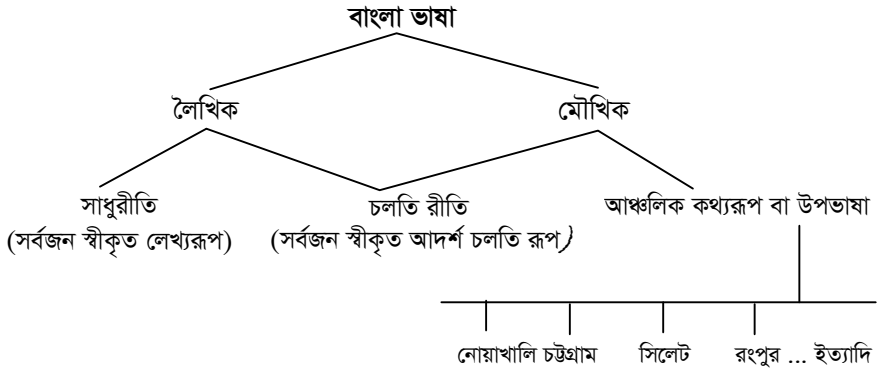

সাধুরীতি

যতদূর জানা যায় 'সাধুভাষা' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ১৮১৫ সালে 'বেদান্ত গ্রন্থ' নামে একটি রচনায় প্রথম ওই শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু সাধুভাষা বলতে তিনি বিশেষ কোন্ ধরনের ভাষারীতিকে বুঝিয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। তবে এ-টুকু বোঝা যায় যাঁরা 'সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন' তাঁদের ভাষাকে বোঝাতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন সাধুভাষা শব্দটি। অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যাঁদের ভাষা ছিল 'সংস্কৃতমূলক' ও 'সংস্কৃতানুসারী'

তাঁদের ভাষাকেই রামমোহন চিহ্নিত করেছিলেন সাধুভাষা বলে। সাধুভাষার বিপরীতে এখন যে 'চলতি' বা 'চলতি' রীতির কথা আমরা বলছি, রামমোহনের বেশ পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে একটি প্রবন্ধে সে বিষয়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ওই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধু ভাষা; অপরটির নাম অপরভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। ... সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ অভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না।" বঙ্কিমচন্দ্র ওই প্রবন্ধে তৎকালীন সাধুভাষাকে আক্রমণ করে বলেছিলেন 'সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা'র কারণেই বাংলা সাহিত্য 'অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল হয়ে উঠেছে'। তাই তাঁর পরামর্শ, 'অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে।' সাধুভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওই সব মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত সাধুভাষার যে সুনির্ধারিত রূপ গড়ে উঠেছিল তাতে তদ্ভব, অর্ধতৎসম প্রভৃতি শব্দের তুলনায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ ছিল বেশি। তবে বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের রচনার মধ্য দিয়ে সাধুভাষা ক্রমে সংস্কৃতের গণ্ডি বা সংস্কৃত ভাষারীতির অপ্রয়োজনীয় বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে ভাষায় তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন তাকে আজ আমরা নিঃসন্দেহে সাধুভাষা বলে চিহ্নিত করি। কিন্তু তিনি তাঁর শেষ দিককার উপন্যাসগুলোয়, আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং 'সীতারাম' (১৮৮৬)-এ যে সাধুভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা ক্রিয়ার আদিম রূপ ছাড়া অনেকখানিই বর্তমানের চলতি বাংলার পূর্বসুরি হবার যোগ্য।

তবে সাধুরীতি বাংলাভাষীদের মুখের ভাষার অনেক কাছাকাছি চলে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধু গদ্যরীতির মাধ্যমে। তিনি ১৯১৪ সালের আগে চলতি ভাষা ব্যবহার করেননি একথা তথ্য হিসেবে সত্য হলেও চলতি বাংলা বা কথ্য বাংলার অনেক কাছাকাছি এসে গিয়েছিল তাঁর গদ্যভঙ্গি। ক্রিয়া ও সর্বনামের আদিম রূপ হয়ত রবীন্দ্রনাথের ১৯১৪ সালের আগেকার গদ্যে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গি অনেক বেশি চলতি বাংলার নিকটবর্তী। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের রীতি প্রতিষ্ঠার সময় বাংলা সাহিত্যিক গদ্য অবলম্বন করেছিল সংস্কৃত ভাষার আদর্শ অর্থাৎ সংস্কৃত রীতির শব্দ চয়ন, সমাস-বাহুল্য, কথ্য ভাষার পদ বর্জন রীতি। ওই শতাব্দীর পণ্ডিতেরাই এ ধরনের ভাষা রীতির নাম দিয়েছিলেন সাধুভাষা। এখানে বলে রাখা দরকার যে সাধু রীতি কখনোই মানুষের অনানুষ্ঠানিক কথাবর্তার ভাষা ছিল না, এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল মুখ্যত সাহিত্য রচনার মধ্যেই।

চলতি ভাষা রীতি

চলতি বাংলা গদ্যরীতির প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে যাঁর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। বয়সের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক। বাংলা সাধু গদ্যরীতির আঁটোসাঁটো বন্ধন থেকে ভাষাকে সহজ স্বাভাবিক করে তোলার বাসনায় তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই প্রবন্ধে তিনি প্রস্তাব করেন যে– ১. বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ রাখার প্রয়োজন নেই; ২. বহুবচনে- গণ প্রত্যয় বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়; ৩. বাংলায় অযথা সন্ধির ভার বাক্যের পক্ষে ক্ষতিকর; ৪. অবিকৃত সংস্কৃত (অর্থাৎ তৎসম) শব্দের তুলনায় রূপান্তরিত (অর্থাৎ তদ্ভব) এবং দেশজ শব্দের ব্যবহারই বাংলায় স্বাভাবিক। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এসব প্রস্তাবে, তাঁর কালের তুলনায়, অনেক বেশি আধুনিক চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু বর্তমানে প্রচলতি চলতি বাংলার সঙ্গে সাধু বাংলার প্রধান যে পার্থক্য অর্থাৎ সর্বনাম ও ক্রিয়া, সে-সম্পর্কে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনো প্রস্তাব নেই। তারপরও বলা যায়, শ্যামাচরণের ওই প্রস্তাবসমূহ চলতি বাংলা প্রবর্তনে বা ভাষাকে, সরল ও সাবলীল করে তোলার ক্ষেত্রে বেগবান করেছিল।
'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর লেখায় তৎকালীন কলকাতার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে সাহিত্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদের ওই ভাষাভঙ্গি অন্যদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে বিকাশ লাভ করেনি; এমনকি প্যারীচাঁদ মিত্র নিজেও ওই ভাষাভঙ্গি পরিত্যাগ করেছিলেন। হয়ত এর অন্যতম কারণ, সমকালের মানুষের সাহিত্য রুচির সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল'- এর ভাষার খুব বেশি ঐক্য সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ফলে 'আলালী ভাষা'র অকাল মৃত্যু ঘটে।

বর্তমানে যাকে আমরা চলতি বাংলা ভাষা বলে চিনি তার প্রবর্তনের ও প্রয়োগের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব পদক্ষেপের জন্য। ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' নামে একটি উঁচুমানের পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন তিনি। ওই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই চলতি বাংলার প্রায়োগিক প্রকাশ ঘটতে থাকে। প্রমথ চৌধুরীর এ প্রচেষ্টা খুব সহজসাধ্য ছিল না। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'কথার কথা' প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমার ইচ্ছে বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই লেখা হয়।' তার কারণ স্বাধীন হয়ে, স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টাতেও সুখ আছে। সংস্কৃতের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বা সংস্কৃতের 'অঞ্চল ধরে বেড়ানো'তে বাংলা ভাষার কোনো কল্যাণ নেই। তারপর তিনি প্রশ্ন করেছেন, কাকে বলে বাংলা ভাষা? উত্তর দিচ্ছেন এভাবে, 'যে ভাষা আমরা সকলে জানি শুনি বুঝি, যে ভাষায় ভাবনা চিন্তা সুখ-দুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি, এবং সম্ভবত আরো বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলা ভাষা। তাই চলতি বাংলার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মতামত হচ্ছে, আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোনো প্রভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই মূল এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।' চলতি বাংলা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর এই মানসিকতা ও সবুজপত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর কুশলতায় আধুনিক বাংলায় চলতি গদ্যরীতি বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে। তা ছাড়া প্রমথ চৌধুরীর প্রতি সব সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। ফলে প্রমথ চৌধুরীর প্রচেষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা গদ্যে চলতি রীতি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিক কারণে পিছিয়ে পড়েছে সাধুরীতি এবং সম্প্রতি তা প্রায় বর্জিত হবারও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সাধু ও চলতি ভাষা কাকে বলে?

২. সাধু ও চলতি ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ২.৪ : সাধু ও চলতি ভাষার পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সাধু ও চলতি ভাষার বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- সাধু ও চলতি ভাষার পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- সাধু থেকে চলতি বা চলতি থেকে সাধুরীতিতে রূপান্তর করতে পারবেন।

সাধু ও চলতি ভাষা

সাধু ও চলতি ভাষার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও জটিলতা তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ শতকের শুরুতে তার গ্রহণযোগ্য মীমাংসা আমরা লাভ করেছি। সাধু ও চলতি ভাষারীতির প্রধান পার্থক্য নির্ভর করে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ওপর। সাধুরীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়ার পূর্ণ ও দীর্ঘরূপ ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে চলতি বাংলায় সর্বনাম ও ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বা হ্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। নিচে ওই সাধু ও চলতি রীতিতে এদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী পার্থক্য ঘটে তা দেখানো হলো :

সর্বনাম		ক্রিয়া	
সাধুভাষা	**চলতি ভাষা**	**সাধুভাষা**	**চলতিভাষা**
তাহারা, তাঁহারা	তারা, তাঁরা	যাইতেছে	যাচ্ছে
তাহাদের,	তাদের	যাইতেছি	যাচ্ছি
তাহাদিগের	তাদের	গিয়াছেন	গিয়েছেন
তাহাদিগকে	তাদের	যাইবেন	যাবেন
উহাদিগকে	ওদের	উপর	ওপর
কাহারা	কারা	বুঝ	বোঝ
সেইগুলির	সেগুলোর	লিখ	লেখ
যাহারা, যাহাদিগের	যারা, যাদের	লিখিবেন	লিখবেন
উহা	ওটা	দিয়াছিল	দিয়েছিল
ইহা	এটা ইত্যাদি	দিবেন	দেবেন
		উঠিতেছিস	উঠছিস
		উঠিবেন	উঠবেন
		শুইয়াছিলাম	শুয়েছিলাম ইত্যাদি

এ কথা সত্য যে সাধু ও চলতি রীতির সম্পর্ক যত সহজ ও সমান্তরাল মনে করা হয়, তা তেমন সহজ ও সমান্তরাল নয়। বাংলা বাক্যে অনেক ক্ষেত্রেই যেহেতু ক্রিয়া উহ্য বা অনুক্ত থাকে তাই বিচ্ছিন্নভাবে একটি বাক্য দেখে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ঐ বাক্যটি সাধু না চলতি রীতির। নিচের বাক্যগুলো লক্ষ করুন :

ক. সায়মার এখন বাড়ি ফেরা উচিত।

খ. দূরের পথ, যত দ্রুত ফেরা যায় ততই ভাল।

গ. সায়মার বাড়ি ঢাকার এক প্রান্তে।

ওপরের তিনটি বাক্যকে তাদের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে বলা প্রায় অসম্ভব যে বাক্যগুলো সাধু নাকি চলতি বাংলার অন্তর্গত। এর প্রধান কারণ বাক্যে যদি সমাপিকা ক্রিয়া উহ্য থাকে অর্থাৎ অনুক্ত থাকে তবে সাধু চলতির পার্থক্য নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব।

আবার কোনো কোনো বাক্যে ক্রিয়ার অনুক্ত না হলেও তার সাধু চলতির গোত্র নিরূপণ দুরূহ। যেমন নিত্য বর্তমান বা বর্তমান অনুজ্ঞায় কিছু কিছু ক্রিয়ার রূপ একবচন ও বহুবচনে এবং সাধু ও চলতি অভিন্ন। উদাহরণগুলো লক্ষ করুন :

আমি/আমরা	শুই
তুমি/তোমরা	শোও
সে/তারা	শোয়

কিন্তু নিত্য বর্তমান ও বর্তমান অনুজ্ঞা ছাড়া অন্যকালের ক্রিয়ারূপে সাধু ও চলতির পার্থক্য স্পষ্ট। যেমন–

সাধু রূপ	**চলতি রূপ**
আমি/আমরা শুইলাম	আমি/আমরা শুলাম
তুমি/তোমরা শুইলে	তুমি/তোমরা শুলে
সে/তারা শুইল	সে/তারা শুল .... ইত্যাদি।

সাধু ও চলতি ভাষার পার্থক্য নিয়ে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধু ভাষা' ও 'সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষা' প্রবন্ধ দুটিতে নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। আমরা এখন সাধু ও চলতি ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মতামতের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করছি। তাঁর মতে, 'লেখার ভাষা শুধু মুখের ভাষার প্রতিনিধি মাত্র'। তাই মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার কোনো পার্থক্য থাকা অনুচিত। একমাত্র সেই ভাষা অবলম্বন করেই আমরা সাহিত্যকে সজীব, করে তুলতে পারব। তবে লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য সব সময়ই লক্ষ করা যায় 'সে পার্থক্য ভাষাগত নয়, স্টাইলগত'। সংস্কৃতের অনুসরণে উনিশ শতকে যে ভাষারীতি গড়ে উঠেছিল প্রমথ চৌধুরী তাকে বলেছেন, 'কবিরাজ বিনিন্দিত মন্দগতি'। ফলে সাধুভাষার গড়নটি হয়ে ওঠে 'চলৎশক্তি রহিত'। 'ভাষার এই আড়ষ্ট ভাবটাই সাধুতার একটা লক্ষণ বলে পরিচিত। তাই বাংলা সাহিত্যে সাধারণ লেখকদের গদ্য গদাই লশ্করি ভাবে চলে, এবং কুলেখকদের হাতের লেখা একটা জড় পদার্থের স্তূপমাত্র হয়ে থাকে। এই জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, লেখাতেও মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গিটি রক্ষা করা।' প্রমথ চৌধুরী মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গিটিকেই চলতি বাংলার আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন নদীয়া-শান্তিপুর এবং ভাগীরথীর উভয় তীরের ডায়ালেক্ট বা উপভাষাকে। তিনি পূর্ববাংলার কিংবা কলকাতার উচ্চারণকে প্রমিত বলে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে, 'ঢাকাই কথা এবং খাস-কলকাত্তাই কথা, অর্থাৎ সুতানুটির গ্রাম্যভাষা, দুয়েরই উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত। ....পূর্ববঙ্গের লোকের মুখে স্বরবর্ণ ছড়িয়ে যায়, কলকাতার লোকের মুখে স্বরবর্ণ জড়িয়ে যায়।' এসব কারণেই নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চলের ডায়ালেক্টকেই তিনি প্রমিত মনে করেছিলেন এবং বর্তমানে প্রচলতি চলতি ভাষা প্রমথ চৌধুরীর আদর্শ অনুসরণ করেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

এই দুটি রীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন– 'সাধু ভাষা মাজা ঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি আটপৌরে সাজ, নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।' ভাষার মৌখিক রূপের আবার দুটো রীতি। যথা:

১. আঞ্চলিক রীতি ও

২. প্রমিত রীতি।

বাংলা ভাষার এই রীতিভেদকে নিচের ছকে দেখানো হলো–

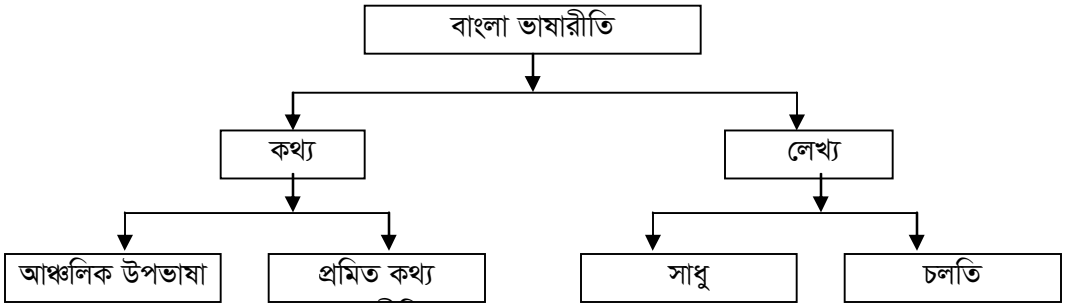

১. কথ্য ভাষা: 'কথ্য' কথাটি এসেছে 'কথা' থেকে। অর্থাৎ, যে ভাষায় আমরা সব সময় কথা বলি, তাকে বলা হয় কথ্য ভাষা। যেমন:

১. এক জনের দুই হুত আছিল।
২. এক মানষের দুই পোয়া আছিল।

ক. আঞ্চলিক উপভাষা : উপভাষা হলো ব্যাপক ভাষা অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষার বিচিত্র রূপ। বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপকে আঞ্চলিক উপভাষা বলে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'বাঙালা ব্যাকরণ" গ্রন্থের আলোকে-
ঢাকা : একন মানশের দুইডা পোলা আছিলো।
বগুড়া : য়্যাক ঝনের দুই ব্যাটা আছিল।
রংপুর : একজন ম্যানশের দুইক্‌না ব্যাটা আছিল্‌।
ময়মনসিংহ: য়্যাক জনের দুই পুৎ আছিল্‌।

খ. প্রমিত কথ্য ভাষারীতি : কথ্য ভাষারীতি মার্জিত হয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য যে রূপ লাভ করেছে, সেই শিক্ষিত লোকের ভাষাকেই প্রমিত কথ্য ভাষারীতি বলা হয়।

২. লেখ্য ভাষা : "লেখ্য" কথাটি মূলত 'লেখা' থেকে এসেছে। যে ভাষায় আমরা বক্তব্য লিখি বা সাহিত্য রচনা করি, তাকে লেখ্য ভাষা বলা হয়।

ক. সাধু ভাষারীতি : যে ভাষারীতিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি এবং ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়, তাকে সাধু ভাষারীতি বলা হয়। যেমন: করিয়াছি, তাহারা, তাহাদের ইত্যাদি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "সাধারণ গদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙালা ভাষাকে সাধু ভাষা বলে।"

খ. চলিত ভাষারীতি : যে ভাষারীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়, তাকে চলিত ভাষারীতি বলে। যেমন; করেচি, তারা, তাদের ইত্যাদি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চলতি ভাষারীতি নিয়ে বলেছেন– "দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ মৌখিক ভাষা রূপে গৃহীত হয়েছে। একে চলতি ভাষা বলা হয়।"

সাধুরীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. সাধু রীতি ব্যাকরণ নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে।
২. সাধু রীতি তৎসম শব্দবহুল ও গুরুগম্ভীর।
৩. সাধু রীতিতে ক্রিয়ার পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: পড়িতেছি, লেখিতেছি ইত্যাদি।
৪. সাধু রীতিতে সর্বনামের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তাহারা, উহারা ইত্যাদি।
৫. সাধু রীতিতে অব্যয়ের তৎসম রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তথাপি, যদ্যপি ইত্যাদি।
৬. সাধু রীতির রূপ সুনির্দিষ্ট।
৭. এই রীতিতে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার বেশি। যেমন: রসনেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিসম্পন্ন ইত্যাদি।

৮. সাধু রীতি প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের অনুসারী।
৯. সাধু রীতি নাটক, বক্তৃতা, সংলাপের উপযোগী নয়।
১০. সাধু রীতি শুধু লেখার উপযোগী।

চলতি রীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. চলতি রীতি ব্যাকরণের সুনির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে না।
২. চলতি রীতিতে তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি।
৩. চলতি রীতিতে ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: পড়ছি, লিখছি ইত্যাদি।
৪. চলতি রীতিতে সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: ওরা, তারা ইত্যাদি।
৫. চলতি রীতিতে অব্যয়ের তদ্ভব রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তবু, যদিও ইত্যাদি।
৬. চলতি রীতি পরিবর্তনশীল।
৭. চলতি রীতিতে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।
৮. চলতি রীতি আধুনিক বৈশিষ্ট্যের অনুসারী।
৯. চলতি রীতি বক্তৃতা, নাটক ও সংলাপের উপযোগী।
১০. চলতি ভাষা কথ্য ও লেখ্য উভয়ই।

গুরুচণ্ডালী দোষ

একই গদ্য রচনায় সাধু ও চলতি উভয় রীতি অসংগতরূপে মিশ্রিত হলে বা লঘুগুরু শব্দের মিশ্রণে ভাষা শ্রুতিকটু হলে, তাকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে।

বাংলা কবিতায় সাধু ও চলতি ক্রিয়া, সর্বনাম প্রভৃতি পদের মিশ্রণ প্রচলতি আছে। উভয় ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয় বলে গণ্য হয় না। কিন্তু বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে সাধু বা চলতি রীতির যেকোনো একটিকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে হয়। লক্ষ রাখতে হয়, যেন উভয় রীতির মিশ্রণ না ঘটে।

যেমন– চলতি ভাষার আধারে একটি সুন্দর বাক্য: "গাড়ি চলতে লাগল, বেলি ঘুমোতে লাগল, বন-পাহাড়-পর্বত-ঝরনা-মেঘ এবং বিস্তর খাঁদা নাক এবং বাঁকা চোখ দেখা দিতে লাগল।" যদি এ বাক্যে সাধু ও চলতি ক্রিয়া ও শব্দের এরকম অসংগত মিশ্রণ ঘটে, "গাড়ি চলতে লাগিল, বেলি ঘুমাইতে লাগল, বন-পাহাড়-পর্বত-ঝরনা-মেঘ এবং বহু খাঁদা নাসিকা এবং বক্র চোখ দেখা দান করিতে লাগল", তাহলে বাক্যটির ভাষা গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট হবে।

সাধু ও চলতি ভাষারীতির মধ্যকার পার্থক্য:

সাধু ভাষারীতি	চলতি ভাষারীতি
১. সাধু ভাষারীতি প্রাচীন ও পুরনো বৈশিষ্ট্যের অনুসারী।	১. চলতি ভাষারীতি আধুনিক ও নতুন বৈশিষ্ট্যের অনুসারী।
২. সাধু ভাষার রীতি ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	২. চলতি ভাষারীতি ব্যাকরণের সকল নিয়ম দ্বারা সমান নিয়ন্ত্রিত নয়।
৩. সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় সাধু ভাষারীতিতে। যেমন- তাহারা, করিয়া প্রভৃতি।	৩. চলতি ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয় না। যেমন: তারা, করে প্রভৃতি।
৪. সাধু ভাষারীতিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি।	৪. চলতি ভাষায় তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের প্রয়োগ বেশি।
৫. সাধু ভাষারীতি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।	৫. চলতি ভাষারীতি পরিবর্তনশীল।
৬. সাধু ভাষারীতি সংলাপ, বক্তৃতা ও নাটকের উপযোগী নয়।	৬. চলতি ভাষারীতি বক্তৃতা, নাটক ও সংলাপের জন্য উপযোগী।
৭. সাধু ভাষারীতিতে অভিশ্রুতি ও অপিনিহিতির ব্যবহার নেই।	৭. চলতি ভাষারীতিতে অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার রয়েছে।
৮. সাধু ভাষারীতিতে অব্যয় পদের তৎসম রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তথাপি, বরঞ্চ ইত্যাদি।	৮. চলতি ভাষারীতিতে অব্যয় পদের তদ্ভব রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: যদি, তবু, বরং ইত্যাদি।

৯. সাধু ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্য নেই।	৯. চলতি ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার ও প্রাধান্য রয়েছে। যেমন: টুকটুক, ভনভন, হনহন ইত্যাদি।
১০. সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: হইতে, নিকট, দিয়া ইত্যাদি।	১০. চলতি ভাষারীতিতে অনুসর্গের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয় না। যেমন: হতে, কাছে, দিয়ে ইত্যাদি।

সাধুরীতিকে চলতি রীতিতে রূপান্তর :

নিয়মের যথাযথ প্রয়োগ করে সাধুরীতিকে চলতি রীতিতে রূপান্তর করা যায়–

১. সর্বনাম পদে 'ই' ধ্বনি থাকলে উক্ত 'ই' ধ্বনি লোপ পায়। যেমন: তোমাদিগের > তোমাদের।

২. ক্রিয়ায় 'ই' ধ্বনি থাকলে উক্ত 'ই' ধ্বনি লোপ পায়। যেমন: যাইব >যাব, খাইব >খাব, হইবে >হবে ইত্যাদি।

৩. ক্রিয়াপদে 'উ' ধ্বনি থাকলে তা চলতি রীতিতে লোপ পায়। যেমন: হউক> হোক, যাউক> যাক, থাকুক> থাক ইত্যাদি।

৪. পদাশ্রিত 'ই' ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ' ধ্বনি 'এ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন: বিয়া> বিয়ে, দিলাম >দিলেম, বিলাত> বিলেত ইত্যাদি।

৫. পদাশ্রিত পূর্ববর্তী 'উ' বা 'ঊ' ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ' ধ্বনি 'ও' বা 'উ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন: কুলা >কুলো, পূজা >পুজো ইত্যাদি।

৬. পদের শেষে 'অ', 'আ' বা 'এ' থাকলে পূর্ববর্তী 'উ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন: বুনা >বোনা, শুনা >শোনা ইত্যাদি।

৭. পদের শেষে অ, আ, এ থাকলে পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনি 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন: ভিজা >ভেজা, লিখ >লেখ ইত্যাদি।

৮. বিশেষণঘটিত পরিবর্তন হয়। যেমন: গ্রাম্য >গেঁয়ো।

চলতি রীতি হতে সাধু রীতিতে রূপান্তর :

নিম্নোক্ত নিয়মাবলির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে চলতি রীতি হতে সাধু রীতিতে রূপান্তর করা যায়:

১. তদ্ভব শব্দকে তৎসম শব্দে রূপান্তর ঘটিয়ে ব্যবহার করা হয়। যেমন: রক্ষা >পরিত্রাণ, মাথা >মস্তক ইত্যাদি।

২. ক্রিয়াকে দীর্ঘরূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন: করছি >করিতেছি।

৩. সর্বনামের দীর্ঘরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তার >তাহার, তাদের >তাহাদের ইত্যাদি।

৪. সন্ধি বা সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার করা হয়। যেমন: তুষারের ন্যায় শুভ্র >তুষারশুভ্র ইত্যাদি।

৫. বিশেষণ শব্দের পরিবর্তন করা হয়। যেমন: খুব >অতি, লাখ >লক্ষ ইত্যাদি।

৬. ধ্বন্যাত্মক কিছু শব্দের পরিবর্তন হয়। যেমন: মরমর >মর্মর ইত্যাদি।

৭. অভিশ্রুতিঘটিত পরিবর্তন হয়। যেমন: ছুটো > ছুটিয়া, মেছো >মেছুয়া মাড়ুয়া ইত্যাদি।

৮. স্বরসংগতিঘটিত পরিবর্তন হয়। যেমন: ভিক্ষে >ভিক্ষা, ফিতে >ফিতা ইত্যাদি।

সাধু ও চলতি রীতির রূপভেদ

সাধুভাষায় গুরুগম্ভীর ভাবপ্রকাশে ও কমগতির উচ্চারণে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে চলতিরীতিতে তা শ্রুতিমধুর, সহজ-সরল, সাবলীল ও সংক্ষিপ্ত রূপ হয়।

বর্তমান কালের রূপভেদ

কাল	সাধু	চলতি	সাধু	চলতি
ঘটমান বর্তমান	বলিতেছেন	বলছেন	হইতেছে	হচ্ছে
	যাইতেছ	যাচ্ছ	খাইতেছে	খাচ্ছে
	করিতেছি	করছি	শুনিতেছিস	শুনছিস
	খেলিতেছে	খেলছে	ঘুমাইতেছ	ঘুমাচ্ছ
পুরাঘটিত বর্তমান	বলিয়াছেন	বলেছেন	হইয়াছে	হয়েছে
	গিয়াছ	গিয়েছ	খাইয়াছে	খেয়েছে
	করিয়াছি	করেছি	শুনিয়াছিস	শুনেছিস
	খেলিয়াছে	খেলেছে	ঘুমাইয়াছ	ঘুমিয়েছ

অতীত কালের রূপভেদ

কাল	সাধু	চলতি	সাধু	চলতি
সাধারণ অতীত	বলিলেন	বললেন	হইল	হলো
	যাইলে	গেলে	খাইল	খেল
	করিলাম	করলাম	শুনিলি	শুনলি
	খেলিলাম	খেললাম	ঘুমাইলে	ঘুমালে
ঘটমান অতীত	বলিতেছিলেন	বলছিলেন	হইতেছিল	হচ্ছিল
	যাইতেছিলে	যাচ্ছিলে	খাইতেছিল	খাচ্ছিল
	করিতেছিলাম	করছিলাম	শুনিতেছিল	শুনছিল
	খেলিতেছিলাম	খেলছিলাম	ঘুমাইতেছিলে	ঘুমাচ্ছিল

কাল	সাধু	চলতি	সাধু	চলতি
পুরাঘটিত অতীত	বলিয়াছিলেন	বলেছিলেন	হইয়াছিল	হয়েছিল
	গিয়াছিলে	গিয়েছিলে	খাইয়াছিল	খেয়েছিল
	করিয়াছিলাম	করেছিলাম	শুনিয়াছিল	শুনেছিল
	খেলিয়াছিলাম	খেলেছিলাম	ঘুমাইয়াছিলে	ঘুমোচ্ছিলে
নিত্যবৃত্ত অতীত	বলিতেন	বলতেন	হইত	হতো
	যাইতে	যেতে	খাইত	খেত
	করিতাম	করতাম	শুনিত	শুনত
	খেলিতাম	খেলতাম	ঘুমাইতে	ঘুমাতে

ভবিষ্যৎ কালের রূপভেদ

কাল	সাধু	চলতি	সাধু	চলতি
সাধারণ ভবিষ্যৎ	বলিবেন	বলবেন	হইবে	হবে
	যাইবে	যাবে	খাইবে	খাবে
	করিব	করব	শুনিব	শুনব
	খেলিব	খেলব	ঘুমাইব	ঘুমাব
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	বলিও	বোলো	হইও	হোয়ো
	যাইও	যেয়ো	খাইও	খেয়ো
	করিও	কোরো	শুনিও, শুনো	শোনো
	খেলিও	খেলো	ঘুমাইও	ঘুমিও

প্রযোজক ক্রিয়ার রূপভেদ

সাধু	চলতি
করাইয়াছি	করিয়েছি
করাইও	করিয়ো
করাইলাম	করালাম
যাওয়াইয়াছি	যাইয়েছি
খাওয়াইও	খাইয়ো

সাধু	চলতি
বলাইয়াছেন	বলিয়েছেন
শোনাইও	শুনিয়ো
শুনাইয়াছিস	শুনিয়েছিস
করাইবেন	করাবেন
শুনাইলি	শুনালি

সাধু	চলতি
খাওয়াইয়াছে	খাইয়েছে
খাওয়াইবে	খাওয়াবে
খাওয়াইল	খাওয়াল
হওয়াইয়াছে	হওয়াইয়েছে
বলাইবেন	বলাবেন

অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপভেদ

সাধু	চলতি
করিতে	করতে
করিয়া	করে
বলিতে	বলতে
বলিয়া	বলে
হইতে	হতে

সাধু	চলতি
যাইয়া	গিয়ে
যাইতে	যেতে
করিলে	করলে
করিবার	করবার
বলিলে	বললে

সাধু	চলতি
বলিবার	বলবার
হইলে	হলে
হইবার	হবার
যাইবার	যাবার
যাইলে	গেলে

যৌগিক ক্রিয়ার রূপভেদ :

সাধুভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার বেশি হয়, চলতি ভাষায় তুলনামূলকভাবে কম হয়। সাধু থেকে চলতি ভাষায় রূপান্তরকালে সাধুভাষার যৌগিক ক্রিয়া পরিবর্তন হয়ে চলতি মৌলিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

সাধু	চলতি
আগমন করা	আসা
আহার করা	খাওয়া

সাধু	চলতি
লম্ফ প্রদান করা	লাফানো
শয়ন করা	শোওয়া

সাধু	চলতি
গ্রহণ করা	নেওয়া
গমন করা	যাওয়া

সাধু	চলতি
শ্রবণ করা	শোনা
নিদ্রা যাওয়া	ঘুমানো

সাধুভাষার যৌগিক ক্রিয়ার পরিবর্তে চলতি ভাষার যৌগিক ক্রিয়া সংক্ষিপ্ত ও সরল হয়ে থাকে এবং বুঝতে সহজ হয়। যেমন– 'গাহিতে গাহিতে গমন করিতেছে' না বলে 'গাইতে গাইতে যাচ্ছে' বললে বাক্যটি সহজ-সরল, বোধগম্য ও শ্রুতিমধুর হয়।

লক্ষণীয়: ক্রিয়াপদে সাধুভাষায় হ থাকলে প্রায় কেবল চলতি ভাষায় হ লোপ পায়। যেমন–

সাধু	চলতি
কহে	কয়
কহিল	কইল
গাহিতাম	গাইতাম

সাধু	চলতি
চাহিল	চাইল
বহিতে	বইতে
কহিবে	কইবে

সাধু	চলতি
গাহিবে	গাইবে
চাহে	চায়
নাহিয়াছে	নেয়েছে

সর্বনামের রূপভেদ: সাধুভাষায় সর্বনামের রূপ পূর্ণ ও বিস্তৃত হয় এবং চলতি ভাষায় সংক্ষিপ্ত হয়। সাধুভাষায় সর্বনামে হ থাকলে চলতি ভাষায় সাধারণত হ বর্জিত হয়। যেমন–

সাধু	চলতি
যাহা	যা
যাঁহার	যাঁর
যাহারা	যারা
তাহা	তা
যাঁহারা	যাঁরা

সাধু	চলতি
তাহারা	তারা
তাঁহারা	তাঁরা
কাহারা	কারা
যাহার	যার
তাঁহাদের	তাঁদের

সাধু	চলতি
তাহার	তার
কাহার	কার
তাঁহার	তাঁর
কাহাদের	কাদের

অনেক সময় চলতি ভাষায় সাধুভাষার সর্বনামের হ কেবল বর্জিত হয় না, ধ্বনিতে অন্যান্য পরিবর্তনও হয়ে থাকে। যেমন–

সাধু	চলতি
ইহা	এটা, এটি
উহা	ওটা, ওটি
ইহারা	এরা
ইহাদের	এদের

সাধু	চলতি
উহারা	ওরা
কেহ	কে
ইহার	এর (এটার, এটির)
উহার	ওর (ওটার, ওটির)

সাধু	চলতি
ইঁহারা	এঁরা
উহাদের	ওদের
উঁহারা	ওঁরা

পুনশ্চ: উঁহার সর্বনামের চলতি রূপ ওঁর; অনেকে এক্ষেত্রে 'ওনার' ব্যবহার করেন। এটি প্রমিত রূপ নয় বলে প্রমিত বাংলায় 'ওনার' সর্বনাম ব্যবহার করা উচিত নয়।

অনুসর্গের রূপভেদ

১। সাধুভাষায় ব্যবহৃত পূর্ণ রূপের জায়গায় চলতি ভাষায় তার সংক্ষিপ্ত বা কোমল রূপ হয়ে থাকে।

সাধু	চলতি
ধরিয়া	ধরে
হইতে	হতে
করিয়া	করে

সাধু	চলতি
পার্শ্বে	পাশে
থাকিয়া	থেকে
বাহিরে	বাইরে

সাধু	চলতি
ভিতরে	ভেতরে
চাইতে	চেয়ে

২। সাধুভাষায় ব্যবহৃত অনুসর্গের পরিবর্তে চলতি ভাষায় সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

সাধু	চলতি
অপেক্ষা	চেয়ে
কারণে	জন্যে
ব্যতীত	ছাড়া

সাধু	চলতি
পশ্চাতে	পেছনে
সহিত	সঙ্গে
হইতে	থেকে

সাধু	চলতি
নিকটে	কাছে
দ্বারা	দিয়ে
ন্যায়	মতো

৩। অনুসর্গযুক্ত পদগুচ্ছেরও রূপভেদ হয়ে থাকে।

সাধু	চলতি
ইহা অপেক্ষা	এর চেয়ে
সর্বাপেক্ষা	সবচেয়ে

সাধু	চলতি
ইহা দ্বারা	একে দিয়ে
তদপেক্ষা	তার চেয়ে

অব্যয়ের রূপভেদ

সাধুভাষায় সংস্কৃত বা তৎসম অব্যয়ের ব্যবহার হয়ে থাকে। চলতি ভাষায় তদ্ভব অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

সাধু	চলতি
অদ্যপি	আজও
অনন্তর	তারপর
কদাপি	কখনো
তথাপি	তবুও
নতুবা	নইলে

সাধু	চলতি
প্রায়শ	প্রায়ই
যদ্যপি	যদিও
অকস্মাৎ	হঠাৎ
কদাচ	কখন
কুত্রাপি	কোথাও

সাধু	চলতি
তথায়	সেখানে
নচেৎ	নইলে
বরঞ্চ	বরং
সহসা	হঠাৎ

দ্রষ্টব্য: কিছু অব্যয় সাধু ও চলতি দুটি রীতিতেই ব্যবহৃত হয়। আবার কিছু অব্যয় কেবল চলতিরীতিতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন – তো, তা, তাহলে, তাইতো, তাই বলে, বলে, নইলে, নয়তো, হলে, পরে, মতো ইত্যাদি।

বিশেষ্যের রূপভেদ:

১। সাধুভাষায় বিশেষ্য পদের তৎসম বা সংস্কৃত রূপ সাধারণত ব্যবহৃত হয়। চলতি ভাষায় বিশেষ করে তৎসম শব্দের তদ্ভব রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাধু	চলতি
অদ্য	আজ
অষ্টপ্রহরীয়	আটপৌরে
কর্ণ	কান
দ্বিপ্রহর	দুপুর
দুগ্ধ	দুধ

সাধু	চলতি
মস্তক	মাথা
চন্দ্র	চাঁদ
অগ্রহায়ণ	অঘ্রান
কণ্টক	কাঁটা

সাধু	চলতি
গৃহিণী	গিন্নি
পত্র	পাতা
পক্ষী	পাখি
বৃক্ষ	গাছ
রাত্রি	রাত

২। অনেক ক্ষেত্রে তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দও ধ্বনি পরিবর্তনের (স্বরসংগতি, অভিশ্রুতি ইত্যাদি) মাধ্যমে কমবেশি পরিবর্তিত রূপে চলতি ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন –

সাধু	চলতি
উপর	ওপর
কুলা	কুলো
টুকরা	টুকরো
মুলা	মুলো
বিলাতি	বিলিতি
বিদ্যা	বিদ্যে
মিঠা	মিঠে
ভিক্ষা	ভিক্ষে
হিসাব	হিসেব

সাধু	চলতি
ভিতর	ভেতর
দেশি	দিশি
আজি	আজ
ফলাহার	ফলার
উঠান	উঠোন
তুলা	তুলো
জুতা	জুতো
পূজা	পুজো
উনান	উনুন

সাধু	চলতি
নাই	নেই
মিথ্যা	মিথ্যে
ফিতা	ফিতে
সিধা	সিধে
ধূলি	ধুলো
মহিষ	মোষ
গামোছা	গামছা
সিপাহি	সেপাই

৩। সাধু রীতিতে ব্যবহৃত কিছু কিছু তৎসম শব্দের পরিবর্তে চলতি ভাষায় সমার্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের পরিবর্তে বিদেশাগত শব্দ চলতি ভাষায় প্রাধান্য পায়। যেমন-

সাধু	চলতি
পত্র	চিঠি
বাতায়ন	জানালা

সাধু	চলতি
লেখনী	কলম
পুস্তক	বই

সাধু	চলতি
বিপণি	দোকান
শয্যা	বিছানা

বহুবচনের রূপভেদ : সাধুভাষায় বিশেষ্য পদের বিভিন্ন ধরনের বহুবচন দেখা যায়। যেমন– উদ্যানসমূহ, পর্বতমালা, পুস্তকাদি, বৃক্ষরাজি, লোকসকল, ভ্রাতৃগণ, সাংবাদিকমহল ইত্যাদি।

কিন্তু চলতি ভাষায় বহুবচনের রূপ সীমিত। চলতি ভাষায় বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রধানত রা/এরা, গুলি/গুলো ইত্যাদি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। বহুবচনের কতকগুলো রূপ কেবল সাধুভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- নিকর (নক্ষত্রনিকর), নিচয় (তারকানিচয়) সমুচ্চয় (দ্রব্যসমুচ্চয়), গ্রাম (গুণগ্রাম), দাম (পুষ্পদাম)।

কারক-বিভক্তির রূপভেদ : সাধুভাষায় ব্যবহৃত কিছু কিছু কারক-বিভক্তি চলতি ভাষায় ভিন্নতর রূপ গ্রহণ করে। যেমন-

সাধু	চলতি
দিগকে	দের

সাধু	চলতি
দিগে	দের

সাধু	চলতি
দিগের	দের

বিশেষণের রূপভেদঃ সাধুভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবে স্ত্রীবাচক শব্দে এবং স্ত্রীবাচক ভিন্ন অন্য শব্দেও স্ত্রীবাচক বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

১. সাধু রীতিতে নারীবাচক শব্দে নারীবাচক বিশেষণঃ

অনাথা, বিধবা
ছলনাময়ী, প্রেমময়ী, মমতাময়ী, নারী
নবমালিকা, কুসুমকোমলা শকুন্তলা
রূপযৌবনসম্পন্না, নিষ্কলঙ্কচন্দ্রাননা, মহামাননীয়া রাজকুমারী
ধর্মশীলা, নম্রস্বভাবা নারী
রণরঙ্গি, খড়্গধারিণী, রুদ্ররূপিণী চণ্ডী

২. সাধু রীতিতে নারীবাচক নয় এমন শব্দেও নারীবাচক বিশেষণঃ

ওজস্বিনী ভাষা
জ্যোৎস্নাপুলকিতা রজনী
তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধা তটিনী
মোহিনী মূর্তি
শস্যশালিনী ভূমি
সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী
সুজলা সুফলা শস্যা শ্যামলা মাতৃভূমি

লক্ষণীয় : কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ প্রীতিমূলক অর্থে পুরুষবাচক শব্দে নারীবাচক বিশেষণ এবং নারীবাচক শব্দে পুরুষবাচক বিশেষণের প্রয়োগ দেয়া যায়।

প্রিয় নার্গিস, ভালো থেকো। [নারীবাচক শব্দে পুরুষবাচক বিশেষণ]
বেশ লক্ষ্মী ছেলে। [পুরুষবাচক শব্দে নারীবাচক বিশেষণ]

বাক্যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধু ও চলিতের রূপভেদ : সাধু ও চলতি রীতির বাক্যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো কেবল সাধুভাষাতেই ব্যবহৃত হয়; অন্যদিকে কিছু শব্দ কেবল চলতি ভাষাতেই প্রত্যাশিত।

তৎসম-অতৎসম শব্দের প্রয়োগ

সাধু রীতিতে তৎসম শব্দের অধিক ব্যবহার দেখা যায়। পক্ষান্তরে, চলতি রীতিতে ওই সব তৎসম শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অতৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি) শব্দের অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে।

সাধু	চলতি
অন্তঃকরণ	মন
উত্তমর্ণ	মহাজন
নিষ্ঠীবন	থুতু
সন্নিধানে	কাছে

সাধু	চলতি
অভিপ্রায়	ইচ্ছা
দর্পণ	আয়না
স্কন্ধ	কাঁধ
সম্যক	যথেষ্ট

সাধু	চলতি
অধ্যয়ন	পড়া
গলদেশ	গলা
তলদেশে	তলায়
বঙ্কিম	বাঁকা

সমাসবদ্ধ শব্দ প্রয়োগে পার্থক্য

সাধুভাষায় দীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দের প্রয়োগ বেশি। এ ধরনের প্রয়োগ ভাষাকে ওজস্বী করে। চলতি ভাষায় সমাসবদ্ধ শব্দ যতটা সম্ভব পরিহার করা হয়। ভাষা পরিবর্তনের সময়ে তাই সাধুভাষার সমাসবদ্ধ পদকে চলতি ভাষায় ভেঙে সহজ করে লেখা হয়। যেমন–

সাধু	চলতি
অভিবাদনপূর্বক	অভিবাদন করে
আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত
আদ্যোপান্ত	আগাগোড়া
বাষ্পাকুললোচনে	অশ্রুসজল চোখে
বাষ্পবারি বিমোচন	চোখের জল ফেলা
নানাভরণভূষিত	নানা রকম গয়না পরা
মনুষ্য সমাজের	মানব সমাজের
দারুনির্মিত	কাঠের তৈরি
দীর্ঘোদর	বিশাল পেট

সাধু	চলতি
উল্লেখশ্রবণমাত্র	কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই
মনস্কামনা	মনের ইচ্ছা
বনস্পতিসঙ্কুল	বড় বড় গাছে ভরা
পূরণার্থ	পূরণের জন্যে
বহুদিনান্তরে	বহু দিন পরে
কিয়ৎক্ষণে	কয়েক মূহূর্তে
রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিক্রমে	রাজার আদেশ পাওয়ার পর
দামেস্কাধিপতি	দামেস্কের অধিপতি
স্বহস্তোৎপাদিত	নিজের হাতে জন্মানো

সন্ধিঘটিত শব্দের প্রয়োগে পার্থক্য

সাধু রীতিতে সন্ধিঘটিত শব্দের ব্যবহার বেশি। বিষয়ের কারণে অপরিহার্য না হলে চলতি ভাষায় আড়ম্বরমুখী সন্ধিজাত শব্দ যতটা সম্ভব পরিহার করা হয়। প্রয়োজনে সন্ধিজাত শব্দ ভেঙে সহজ করে লেখা হয় কিংবা তদ্ভব রূপ দেওয়া হয়।

সাধু	চলতি
উৎসবার্থ	উৎসবের জন্যে
তদ্বিষয়ে	সেবিষয়ে
তদ্বিপরীত	তার বিপরীত
তন্নিমিত্ত	তার জন্যে
প্রথানুসারে	প্রথা অনুসারে

সাধু	চলতি
রসাভিষিক্ত	রসে অভিষিক্ত
রাজাজ্ঞা	রাজার হুকুম
গাত্রোত্থান	ওঠা, গা তোলা
তদুপরি	তার ওপরে
তদ্দর্শনে	তা দেখে

সাধু	চলতি
প্রত্যুত্তরে	তার উত্তরে/
মনস্কামনা	মনের ইচ্ছা
মস্তকোপরি	মাথার ওপরে

শব্দদ্বিত্বের প্রয়োগে পার্থক্য

সাধু রীতিতে শব্দদ্বিত্ব প্রয়োগের রীতি নেই। তা চলতি রীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন– আইঢাই, আধাআধি, কাছাকাছি, ফ্যালফ্যাল, উসখুস, ফিসফাস, হাইফাই ইত্যাদি চলতি ভাষার নিজস্ব সম্পদ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগে পার্থক্য

ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার সাধু রীতিতে নেই বললেই চলে। এ ধরনের শব্দ চলতি রীতিতেই প্রচুর ব্যবহৃত হয়। যেমন– ক্যাঁটকেটে (রং), কুচকুচে (কালো), খাঁ খাঁ (রোদ), ঝমঝম (বৃষ্টি), ঝিরঝির (বাতাস), টুকটুকে (লাল), গনগনে (আগুন), শোঁ-শোঁ (হাওয়া), ফুরফুরে (মেজাজ), ধবধবে (সাদা) ইত্যাদি।

বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগে পার্থক্য

বাগধারা প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি চলতি ভাষার নিজস্ব সম্পদ। সাধুভাষায় এদের ব্যবহার নেই বললেই চলে। এদের প্রয়োগ অনেক সময় সাধুভাষাকে কৃত্রিম করে তোলে। যেমন- 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা', 'ধান ভানতে শিবের গীত' ইত্যাদি চলতি ভাষারই সম্পদ।

অলংকার প্রয়োগে পার্থক্য

প্রাচীন রীতির সমাসবদ্ধ উপমা প্রয়োগ সাধুভাষার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। প্রদত্ত উদাহরণগুলোর মতো আলংকারিক শব্দপ্রয়োগ চলতি ভাষায় দেখা যায় না। ঋণজাল, যাতনাযন্ত্রে পেষণ, লোভানলে আহুতি, লোভরিপু, শোকসিন্ধু, বিষাদ-বারিপ্রবাহ, নবনীরদ-নন্দিত। বাংলা ভাষার উচ্চারণের ক্ষেত্রে অভিশ্রুতি, স্বরসংগতি, অপিনিহিতি ইত্যাদি নিয়ম প্রচলতি আছে। এসব উচ্চারণ রীতি সাধু ও চলতিরীতির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তা কখনো বা এগুলোর মধ্যবর্তী স্বরধ্বনির যোগ ঘটায়, আবার কখনো তা ই-কার যোগে ভাষারীতির মধ্যে রূপভেদ সৃষ্টি করে। এগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শব্দের মাঝখানে ই-কারের লোপ

সাধু রীতি : যাহা, তাহা, ইহা, তাহাকে, যাহাকে, কাহাকে, কাহারও, ইহাদের, ইহারা, যাহারা, তাহারা ইত্যাদি।
চলতি রীতি: যা, তা, এ, তাকে, যাকে, কাকে, কারো, এদের, এরা, যারা, তারা ইত্যাদি।

সমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে

সাধু রীতি : কহিল, গাহিল, চাহিল ইত্যাদি।
চলতি রীতি : কইল, গাইল, চাইল ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে

সাধু রীতি : সহিতে, কহিতে, রহিতে ইত্যাদি।
চলতি রীতি : সইতে, কইতে, রইতে ইত্যাদি।

শব্দের মধ্যবর্তী স্থলে ই-কার লোপের আরও দৃষ্টান্ত

সাধু	চলতি
সিপাহি	সেপাই
দধি	দহি > `B

সাধু	চলতি
বেহাই	বেয়াই
ফলাহার	ফলার

সাধু	চলতি
রহিল	রইল
সহিল	সইল

ক্রিয়াভেদের মধ্যবর্তী স্থলে ই বা উ ধ্বনি লোপের উদাহরণ:

সাধু রীতি : যাউক, খাউক, লউক, খাওয়াইবি, নাওয়াইব, জানাইব ইত্যাদি।

চলতি রীতি : যাক, খাক, নিক, খাওয়াব, নাওয়াব, জানাব ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধু রীতির শব্দের আগে বা পরের স্বরধ্বনি পদের মধ্যবর্তী স্থলের স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। ব্যাকরণের ভাষায় একে বলে স্বরসংগতি। যেমন –

ক. শব্দের কোনো অক্ষরে অ, আ বা এ থাকলে এর পূর্ববর্তী ধ্বনি- এ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তন সাধু ও চলতি ভাষারীতিকে প্রভাবিত করে। যেমন– সাধুভাষায় লেখা হয়– লিখ, শিখ, লিখা, লিখালিখি, শিখাশিখি, শিয়াল ইত্যাদি।

খ. পরবর্তী অক্ষরে অ, আ বা এ থাকলে পূর্ববর্তী 'উ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হওয়ার উদাহরণ: যেমন– সাধুভাষায়– শুন, শুনা, শুনে, বুঝে, বুঝানো, গুছানো, উঠ, উঠানো, বুঝা ইত্যাদি।

গ. পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী অক্ষরের 'আ' ধ্বনির এ ধ্বনিতে পরিবর্তনের উদাহরণ:
সাধু ভাষারীতিতে : মিছা, ফিতা, মিঠা, গিয়ে, দিয়ে ইত্যাদি।
চলতি ভাষারীতিতে : মিছে, ফিতে, মিঠে, গিয়ে, দিয়ে ইত্যাদি।

ঘ. আগে উ, ঊ থাকলে শেষে আ-হয়ে যাওয়ার উদাহরণ:
সাধু ভাষারীতিতে : রূপা, ধূলা, কুলা, মূলা, চুলা ইত্যাদি।
চলতি ভাষারীতিতে : রুপো, ধুলো, কুলো, মুলো, চুলো ইত্যাদি।

স্বরসংগতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির প্রভাবে সাধুভাষায় শব্দ পরিবর্তিত হয়ে চলতি রূপ লাভ করার আরও কিছু নমুনা প্রদত্ত হলো :

সাধু	চলতি
বলিয়া	বলে
আসিয়া	এসে
ভাসিয়া	ভেসে
হাসিয়া	হেসে
কালিয়া	কেলে

সাধু	চলতি
ছুটিয়া	ছুটে
লুটিয়া	লুটে
দেখিয়া	দেখে
যাইত	যেত
খাইত	খেত

সাধু	চলতি
হইত	হতো
বহিত	বইত
কহিত	কইত
লইত	নিত
সহিত	সইত

উল্লেখ্য যে, উভয়ের নিয়মকানুন ও পরিবর্তনের দৃষ্টান্তগুলো স্মরণ রাখলে সাধুরীতি থেকে চলতিরীতিতে ও চলতিরীতি থেকে সাধুরীতিতে রূপান্তর অনেক সহজ হয়ে যাবে।

সাধুরীতি থেকে চলতিরীতিতে পরিবর্তন

১. **সাধুরীতি :** ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়। - অপরিচিতা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চলতিরীতি : ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা নিয়ে পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সঙ্গে তুলনা করে, বিদ্রূপ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এতে তখন বড় লজ্জা পেতাম; কিন্তু বয়স হয়ে এ কথা ভেবেছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে স্বরূপ এবং পণ্ডিতশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমন করেই প্রকাশ পায়।

২. **সাধুরীতি :** এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিং দিব।

চলতিরীতি : এখন নিজের জায়গায় যাও, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দেবে বলেছে, জলযোগের সময় এসো, উভয়ে ভাগ করে খাব। আজ আর কারও হাঁড়ি খেয়ো না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে আবার এসো, এক সরিষাভোর (সরিষা দানার পরিমাণ) আফিং দেব।

৩. **সাধুরীতি :** তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহারই যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে।

চলতিরীতি : তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তারই যার শক্তি অপরিমেয়, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় দুপুরের সূর্যের মতো, বিপুল যার আশা, ক্লান্তিহীন যার উৎসাহ, বিরাট যার ঔদার্য, অফুরন্ত যার প্রাণ, অটল যার সাধনা, মৃত্যু যার মুঠিতলে।

৪. **সাধুরীতি :** বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষ্যে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, গ্রহণশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি পায়।

চলতিরীতি : বাল্যকাল হতে আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ নেই। শুধু যা কিছু নিতান্ত প্রয়োজন তাই কণ্ঠস্থ করছি। তেমন করে কোনো মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। আনন্দের সঙ্গে পড়তে পড়তে পড়বার শক্তি অলক্ষ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে, গ্রহণশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজ ও স্বভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি পায়।

চলতিরীতি থেকে সাধুরীতিতে পরিবর্তন

১. **চলতিরীতি :** নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শুনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই।

সাধুরীতি : নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদিগকে সার্থকতার গান গাহিয়া শুনায়। অনুভূতির কান দিয়া সেই গান শুনিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাহাই।

২. **চলতিরীতি :** বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার পথে দেখতে গেলাম বুড়িকে। বুড়ি শুয়ে আছে একটা মাদুরের ওপর, মাথায় মলিন বালিশ। আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বুড়ি চোখ মেলে আমার দিকে চাইল।

সাধুরীতি : বিকালের দিকে বেড়াইতে যাইবার পথে দেখিতে গেলাম বুড়িকে। বুড়ি শুইয়া আছে একটা মাদুরের উপর, মাথায় মিলন বালিশ। আমি গিয়া নিকটে দাঁড়াইতেই বুড়ি চোখ মেলিয়া আমার দিকে চাহিল।

৩. **চলতিরীতি :** তাও বুঝতুম, যদি বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকত, আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালি যদি হটেনটট হত তবে কোন দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, "বাঙালির-পয়সার অভাব।" বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা?

সাধুরীতি : তাহাও বুঝিতাম, যদি বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকিত, আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালি যদি হটেনটট হইত তাহা হইলে কোন দুঃখ ছিল না। এই রকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোন জায়গায় দেখি নাই। জ্ঞানতৃষ্ণা তাহার প্রবল, কিন্তু বই কিনার বেলায় সে অবলা। আবার কোন কোন বেশরম বলে, "বাঙালির পয়সার অভাব" বটে? কোন জায়গায় দাঁড়াইয়া বলিতেছে মানুষটা এই কথা?

৪. **চলতিরীতি :** সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসে। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়।

সাধুরীতি : সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কাহারও মনোরঞ্জন করা নয়। এই দুইয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে সেইটি ভুলিয়া গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করিয়া অপরের জন্য খেলনা তৈয়ার করিতে বসে। সমাজের মনোরঞ্জন করিতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হইয়া পড়ে তাহার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নহে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সাধুরীতি ও চলতিরীতির বৈশিষ্ট্য লিখুন।

২. সাধুরীতি ও চলতিরীতির পার্থক্য লিখুন।

৩. সাধুরীতি থেকে চলতিরীতিতে রূপান্তর করুন।

ক. মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এসব চলিবে না, বলিয়া রাখিতেছি।"

খ. স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তপোষের উপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই।

গ. **সাধুরীতি :** দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না।

৪. চলতিরীতি থেকে সাধুরীতিতে রূপান্তর করুন।

ক. কাক-ডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতাম আমরা। তপু উঠত সবার আগে। ও জাগাতো আমাদের দুজনকে। ওঠো, ভোর হয়ে গেছে দেখছ না? অমন মোষের মতো ঘুমোচ্ছ কেন, ওঠো। গায়ের ওপর থেকে লেপটা টেনে ফেলে দিয়ে জোর করে আমদের ঘুম ভাঙাতো তপু। মাথার কাছের জানালা খুলে দিয়ে বলতো, দেখো বাইরে কেমন মিষ্টি রোদ উঠেছে। আর ঘুমিয়ো না, ওঠো।

খ. **চলতিরীতি :** কাব্যরস নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্য দায়ী এ যুগের স্কুল এবং তার মাষ্টার। কাব্য পড়বার ও বোঝবার জিনিস, কিন্তু স্কুল মাস্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুল মাস্টার দণ্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে কবির মনের মিলন দূরে থাক, চার চক্ষুর মিলনও ঘটে না।

গ. **চলতিরীতি :** আস্তে চুপি চুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদির ঘুম না ভাঙে। অতি সপ্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদির বাপের আমলের গোরটা নেই, গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরনো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো যাতে সহজ হয়।